SYNOPSIS OF THE PROPOSED THESIS

(পিএইচডি-এর জন্য প্রস্তাবিত রূপরেখা)

প্রস্তাবিত গবেষণার বিষয় :

সাপ্তাহিক বাংলা সাহিত্য পত্রিকা 'অমৃত' : প্রত্যাশা ও প্রাপ্তির রূপরেখা

SAPTAHIK BANGLA SAHITYA PATRIKA 'AMRITA' : PRATYASHA O PRAPTIR RUPAREKHA

উপস্থাপক : সন্ধ্যা মণ্ডল

Enrollment No : PU/PHD/BENG/2018/026

তত্ত্বাবধায়ক : ড. স্বরূপা বন্দ্যোপাধ্যায়

বাংলা বিভাগ

প্রেসিডেন্সি বিশ্ববিদ্যালয়

কলকাতা – ৭৩

২০১৯

সাপ্তাহিক বাংলা সাহিত্য পত্রিকা 'অমৃত': প্রত্যাশা ও প্রাপ্তির রূপরেখা

ভূমিকা:

স্বাধীনতা উত্তর বাঙালি সমাজে প্রধানতম সমস্যা ছিল দেশভাগ এবং তদানন্তীন পূর্ব পাকিস্তান থেকে বিপুল ছিন্নমূল মানুষের পশ্চিমবাংলায় আগমন। বিংশ শতকের ষষ্ঠ দশক থেকেই এই অনাহূত মানুষজন স্থিত হতে থাকে। ফলে ১৯৬০ সালের পর থেকেই শিক্ষিত বাঙালির সংখ্যা হঠাৎ অনেকটা বৃদ্ধি পায় এবং একটি সারস্বত আশ্রয় খুঁজতে থাকে। কলিকাতায় বাগবাজারের আনন্দ চ্যাটার্জী লেনে তখন 'অমৃতবাজার পত্রিকা' ও 'যুগান্তরে'র অফিসকে কেন্দ্র করে একটি সাহিত্যিক পরিমণ্ডলের ভূমিকা রচিত হচ্ছিল। ১৯৬১ সালে সাপ্তাহিক 'অমৃত' প্রকাশের পর থেকেই একটি স্বতন্ত্র ধারা গঠিত হয়। সমকালীন যুগ চাহিদা ও সাংস্কৃতিক প্রেক্ষিতে এই সাময়িক পত্রিকার উদ্ভব অবশ্যম্ভাবী হয়ে উঠল।

রবীন্দ্রনাথের জন্মের শতবর্ষপূর্তি উপলক্ষে তাঁর বিপুল কীর্তিকে উদ্দেশ করে প্রারম্ভিক সংখ্যায় রচনাটির মধ্যেই সাপ্তাহিক 'অমৃত' পত্রিকার নামকরণ এবং পত্রিকা প্রকাশের উদ্দেশ্য নিহিত রয়েছে। ১৩৬৮ বঙ্গাব্দের ২৯ বৈশাখ (১২ মে, ১৯৬১), সাপ্তাহিক 'অমৃত'-র ১ম বর্ষের ১ম সংখ্যায় লেখা হয়েছে — "এই সাহিত্য পত্রিকা 'অমৃত' নাম ধারণ করিয়া রবীন্দ্র-শতাব্দীর পূর্ণ বৈশাখে আত্মপ্রকাশ করিতেছে — উদ্দেশ্য জীবনের অমৃতরসের সন্ধান ও পরিবেশন"। সম্পাদক তুষারকান্তি ঘোষের এই মহৎ উদ্দেশ্য লক্ষ করা গেছে 'অমৃত'-এর প্রতি পদক্ষেপে। সেইপথে আলোকপাত করার কারণেই এই গবেষণা-পত্রের উপস্থাপনা। এবং একইসাথে বলা যেতে পারে সাময়িক পত্রের বহমান ধারায় 'মাসিক বসুমতি' (১৯২২), 'পরিচয়' (১৯৩১), 'পূর্বাশা' (১৯৩২), 'দেশ' (১৯৩৩) প্রভৃতি পত্রিকাগুলি গবেষণা জগতে অনুশীলিত হলেও, বিলুপ্ত সাহিত্য পত্রিকা 'অমৃত'-কে নিয়ে কোনো কাজ তেমনভাবে লক্ষ্য করা যায় না। তাই এক দায়বদ্ধতা এবং পত্রিকাটির প্রতি গভীর ভালোবাসা থেকেই বর্তমান গবেষণাটির উদ্যোগ গ্রহণ করা হল।

গবেষণার উদ্দেশ্য :

১ম বর্ষের ১ম সংখ্যার সম্পাদকীয়তে উল্লিখিত রয়েছে, “আজ সাহিত্যকর্মী ও সাহিত্যিকের সংখ্যা কম নহে এবং সাহিত্য পাঠকের সংখ্যাও অজস্র। এবং বাজারে যে সমস্ত সাহিত্যপত্র ও পত্রিকা প্রচলিত একমাত্র সেগুলিই সাহিত্যরসপিপাসুদের দাবী মিটাইবার পক্ষে যথেষ্ট নহে — এদিক দিয়া নিশ্চয় নতুন উদ্দমের প্রয়োজন আছে। সেই প্রয়োজনের সাথে সঙ্গতি রাখিবার জন্যই আমাদের এই চেষ্টা”। সম্পাদক তুষারকান্তি ঘোষের এই গভীর প্রচেষ্টার নিরিখে প্রস্তাবিত গবেষণার উদ্দেশ্য সমূহ আলোকপাত করা যেতে পারে।

এক— সাপ্তাহিক সাময়িকপত্র হিসাবে ‘অমৃত’-র ক্ষুদ্র আয়ুষ্কালটি (১৯৬১-১৯৮১) ‘দেশ’ পত্রিকার অনেকটাই অনুরূপ ও সমমানের ছিল। প্রায় সমমর্যাদার পত্রিকা হলেও ‘অমৃত’-এর স্বাতন্ত্র্যই এই গবেষণার উদ্দেশ্যকে প্রতিষ্ঠিত করে ।

দুই— সমকালীন সময়ে প্রকাশিত পত্রিকা সমূহের পাশাপাশি ‘অমৃত’-এর বৈশিষ্ট্যকে প্রতিষ্ঠিত করা।

তিন— সাহিত্য পত্রিকা ‘অমৃত’-তে প্রকাশিত রচনাসমূহের বিশ্লেষণ ও রচনার বিষয়টি আলোকিত করা।

চার— সাধারণত সাময়িকপত্রের সম্পাদকীয় রচনাগুলি দেশ ও কালের ভিত্তিতে একটি বিশেষ দিক নির্দেশ করে। এই প্রেক্ষিতে সাপ্তাহিক ‘অমৃত’-এর সম্পাদকীয়গুলি অত্যন্ত মূল্যবান। সুতরাং এগুলির ব্যতিক্রমী বৈশিষ্ট্যগুলি আলোচনা করার আবশ্যিকতা রয়েছে।

গবেষণার পদ্ধতি :

গৃহীত গবেষণা বিষয়টির মূল আলোচ্য কেন্দ্র ‘অমৃত’ পত্রিকা। পত্রিকাটির নিবিড় অনুক্ষণে সাহিত্য-অনুষঙ্গগুলি একত্রিত করতে হবে। ফলে বর্ণনামূলক পদ্ধতি গ্রহণের সাথে সাথে নানা বিভাগে পৃথক করার কার্য-কারণ ব্যাখ্যা করা প্রয়োজন। সেক্ষেত্রে ব্যাখ্যামূলক পদ্ধতিরও গুরুত্ব রয়েছে। একইসাথে দুষ্প্রাপ্য ও দুর্মূল্য সংরক্ষিত পত্রিকা পাঠের ক্ষেত্রে গ্রন্থাগারের সহযোগিতার প্রয়োজন। অর্থাৎ, তুলনামূলক, বর্ণনামূলক ও ব্যাখ্যামূলক পদ্ধতির সাহায্যে গবেষণাটি সম্পূর্ণ করা সম্ভব।

সাপ্তাহিক বাংলা সাহিত্য পত্রিকা ‘অমৃত’: প্রত্যাশা ও প্রাপ্তির রূপরেখা

- **প্রস্তাবিত গবেষণার সম্ভাব্য অধ্যায় বিন্যাস**

প্রস্তাবনা

প্রথম অধ্যায় : ‘অমৃত’ পত্রিকার সম্পাদকীয় : দেশ ও কালের প্রতিফলন

দ্বিতীয় অধ্যায় : সাপ্তাহিক ‘অমৃত’ পত্রিকার সূচি-সংকলন

তৃতীয় অধ্যায় : ‘অমৃত’ সাহিত্য পত্রিকায় রবীন্দ্রপ্রসঙ্গ

চতুর্থ অধ্যায় : স্বামী বিবেকানন্দ ও সাপ্তাহিক ‘অমৃত’

পঞ্চম অধ্যায় : ‘অমৃত’-এ প্রকাশিত প্রবন্ধ ও বিশেষ নিবন্ধ

ষষ্ঠ অধ্যায় : সাপ্তাহিক ‘অমৃত’-এর কথাসাহিত্য

সপ্তম অধ্যায় : ‘অমৃত’-য় প্রকাশিত কবিতা সম্ভার

অষ্টম অধ্যায় : নাটক প্রকাশনা এবং নাট্য-আলোচনায় ‘অমৃত’ পত্রিকা

উপসংহার

পরিশিষ্ট

গ্রন্থপঞ্জি

প্রস্তাবনা

বাংলা সাময়িকপত্রের ইতিহাসে ‘মাসিক বসুমতী’ (১৯২২), ‘শনিবারের চিঠি’ (১৯২৭), ‘পরিচয়’ (১৯৩১), ‘পূর্বাশা’ (১৯৩২) ও ‘দেশ’ (১৯৩৩) গত শতাব্দীর তৃতীয় ও চতুর্থ দশক থেকেই একটি বিশেষ সাহিত্য বৈশিষ্ট্য বহন করছে। এর মধ্যে নীরদচন্দ্র চৌধুরী ও সজনীকান্ত দাস সম্পাদিত ‘শনিবারের চিঠি’ এবং ‘মাসিক বসুমতী’, সুধীন্দ্রনাথ দত্ত ও হীরণকুমার সান্যাল সম্পাদিত ‘পরিচয়’, সঞ্জয় ভট্টাচার্য সম্পাদিত ‘পূর্বাশা’ পত্রিকা চতুষ্ঠয় ছিল প্রধানত মাসিক পত্রিকা। ১৯৫৭ সালে ‘পূর্বাশা’-র গৌরবময় যুগের অবসান ঘটলে সাময়িকপত্রভিত্তিক সাহিত্য আন্দোলনে একটি শূন্যতার সৃষ্টি হয়। ততদিনে প্রবীণ ও জনপ্রিয় লেখকগোষ্ঠীর পাশাপাশি শক্তিমান আধুনিক লেখকদলের আবির্ভাব ঘটেছে। সাপ্তাহিক সাময়িকপত্রের একটি বিশেষ ভূমিকা থাকে এই বহমান সাহিত্যধারায়। ধারাবাহিক উপন্যাস, প্রবন্ধ ও সাংস্কৃতিক আলোচনার ক্ষেত্রে তাই সাপ্তাহিক সাময়িকপত্রগুলি স্বাভাবিকভাবেই সাহিত্যরসপিপাসু পাঠকের কাছে অত্যন্ত জনপ্রিয় হয়ে ওঠে।

স্বাধীনতার কাছাকাছি সময় থেকেই ‘দেশ’ ক্রমশ সাংস্কৃতিক পত্রিকায় রূপান্তরিত হতে শুরু করে। এর পরবর্তীকালের উল্লেখযোগ্য পত্রিকাগুলি হলো ‘যুগবাণী’ (১৯৪৮, সম্পাঃ দেবজ্যোতি বর্মন), ‘কৃত্তিবাস’ (১৯৫৩, সম্পাঃ সমরেন্দ্র সেনগুপ্ত ও সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়), ‘নবকল্লোল’ (১৯৫৯, সম্পাঃ সুবোধ মজুমদার), ‘চতুষ্কোণ’ (১৯৬১, সম্পাঃ শিবপ্রসাদ চক্রবর্তী), ‘অনুষ্টুপ’ (১৯৬৩, সম্পাঃ অনিল আচার্য্য), ‘নন্দন’ (১৯৬৩, সম্পাঃ সৈয়দ শাহেদুল্লাহ), নবপর্যায়ের ‘কালি ও কলম’ (১৯৬৭, সম্পাঃ বিমল মিত্র ও শচীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়)। তবে পূর্বে উল্লিখিত এবং এইসব সাময়িকপত্রগুলি ছিল প্রধানত মাসিক পত্রিকা। এর মধ্যে সাপ্তাহিক ‘দেশ’-এর পাশাপাশি সাপ্তাহিক ‘অমৃত’ পত্রিকার একটি বিরাট ভূমিকা রয়েছে বাংলা সাহিত্য ক্ষেত্রে।

১৩৬৮ থেকে ১৩৮৮ (১৯৬১-১৯৮১), মাত্র কুড়ি বছর আয়ু একটি সাপ্তাহিক পত্রিকার। সময়টি বাঙালি জীবনের ক্রান্তিকাল। সেই সময়ের প্রবল সামাজিক আন্দোলনের মধ্যেও বাঙালি পাঠক মনে হয় আরও একটি সাংস্কৃতিক আশ্রয় খুঁজছিল। রাজনীতির সাথে সাথেই চলচ্চিত্র ও নাট্য, বিজ্ঞান-ক্লাব ও সাহিত্য আন্দোলনের জোয়ার আছড়ে পড়ে বাঙালির সমাজ জীবনে। স্বাধীনতা, দেশভাগ এবং সর্বোপরি পূর্ববঙ্গ থেকে আগত বিপুল জনগোষ্ঠীর আগমন একটি সারস্বত চাহিদার সৃষ্টি করেছিল। জ্ঞানস্পৃহা ও জাতির অঙ্কুরের অন্বেষণই ‘অমৃত’-র মত একটি জনপ্রিয় সাপ্তাহিকের জন্ম দেয়।

বাংলা সাময়িকপত্রে ‘দেশ’ পত্রিকার একটি সুদীর্ঘ ইতিহাস আছে (১৯৩৩ সাল থেকে যা আজও বহমান)। একই সময় থেকে ‘পূর্বাশা’ (প্রধানত মাসিক পত্রিকা)-র একটি সমধারা গল্প-উপন্যাস-কবিতা-প্রবন্ধ আলোচনায় সমৃদ্ধ ছিল। ১৯৫৭ সালে ‘পূর্বাশা’-র গৌরবময় যুগের অবসান ঘটলে যুগ-চাহিদার প্রেক্ষিতে একটি শূন্যতার সৃষ্টি হয়। প্রবীণ ও নবীন সাহিত্যিকের বিপুল ভার হয়তো ‘দেশ’ পত্রিকার পক্ষে বহন করা সম্ভব হচ্ছিল না। বাঙালির জ্ঞান ও চেতনার উন্মেষে তাই ‘অমৃত’-র মতো একটি সাময়িক পত্রের উদ্ভব অবশ্যম্ভাবী হয়ে ওঠে। আনন্দবাজার গোষ্ঠীর ‘দেশ’-এর সমান্তরালভাবে দৈনিক ‘যুগান্তর’ সংবাদপত্র কার্যালয় থেকে সাপ্তাহিক ‘অমৃত’ পত্রিকার প্রকাশ একটি যুগান্তকারী ঘটনা। সময় ও সাহিত্যের প্রেক্ষিতে

‘অমৃত’-র সূচনাকালটি ছিল বিপুল প্রত্যাশা ও সম্ভাবনার ইঙ্গিতবাহী। সমগ্র আয়ুষ্কালে ‘অমৃত’ পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন তুষারকান্তি ঘোষ।

কোনো সাময়িক পত্রিকার আয়ুষ্কাল নির্ভর করে মূলত তার নিজস্ব লেখকগোষ্ঠীর উপর। প্রায় কুড়ি বছরের (১৯৬১-১৯৮০) এই সময়কালটিতে একটি বৃহৎ সাহিত্যগোষ্ঠী ‘অমৃত’-কে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছিল। তবু সাপ্তাহিক ‘অমৃত’-র শেষ সংখ্যা বেরোয় ১৯৮০ সালের ফেব্রুয়ারিতে। শেষ শারদীয়া সংখ্যাটিও একই বছরে।

তারপরেও এই জনপ্রিয় পত্রিকাটির আয়ুষ্কাল দীর্ঘ হল না। কারণ তখন ক্রমশ যুগান্তর পত্রিকাগোষ্ঠীর সংকটকাল শুরু হয়ে গিয়েছে। একই গোষ্ঠীভুক্ত দৈনিক পত্রিকাটির অবস্থা কিছুটা শোচনীয় হয়ে পড়লে, তাদের সাপ্তাহিক সাময়িক পত্রটিতে প্রথমেই বিপর্যয় নেমে আসে। ‘অমৃত’-এও তার ব্যতিক্রম হল না।

প্রকৃতপক্ষে উচ্চমানের সাময়িকপত্র ও লেখকগোষ্ঠীর উন্মেষ ঘটে সমকালের জনজীবন ও সাহিত্য পাঠককুলের অনুসারে। এটিই মনে হয় যুগ-চাহিদা। বিংশ শতাব্দীর ষাট ও সত্তরের দশকে যে বিপুল সাহিত্যিক অনুসন্ধিৎসা সেই সময়ের পাঠক অর্জন করেছিল, তারই ফলশ্রুতিতে ঐরাবতসদৃশ ‘দেশ’ পত্রিকার পাশাপাশি প্রায় সমমানের একটি সময়িকপত্রের উদ্ভব ঘটে। সাহিত্যসচেতন সমাজজীবন সেদিন দুটি পত্রিকাকেই একইসাথে গ্রহণ করতে পেরেছিল। ‘অমৃত’-র সম্পাদক তুষারকান্তি ঘোষ এই দুরূহ ভারটি অতি সুনিপুণভাবে বহন করেছেন। আশির দশকের প্রথমার্ধ থেকেই বাঙালির জনজীবনে প্রযুক্তিগত বিনোদনের প্রভাব বৃদ্ধি পেতে থাকে। হ্রাস পায় জ্ঞানান্বেষণের স্পৃহাও।

এই সাহিত্য-ইতিহাস-বিস্মৃত জাতি ‘পূর্বাশা’-কে ভুলে গেছে। কিন্তু এই সেদিনের ‘অমৃত’ পত্রিকাটি তাদের মনের অন্তরালে চলে গেল কেমনভাবে, তা এক অপার বিস্ময়! বাঙালির ঘরে ঘরে, গ্রন্থাগারে সেইসময়ে ‘দেশ’ ও ‘অমৃত’ পত্রিকা সংগৃহীত হতো একইসাথে। এখনও হয়তো কোনও পাঠাগারে অথবা কারও ব্যক্তিগত সংগ্রহে খুঁজে পাওয়া যেতে পারে নিউজ-প্রিন্টে ছাপা হলুদ হয়ে যাওয়া সাপ্তাহিক, বিশেষ সংখ্যা এবং শারদীয় অমৃত পত্রিকাগুলি। বাংলা সাহিত্যে নিরবিচ্ছিন্ন গৌরবের প্রেক্ষিতে ‘অমৃত’ সাময়িক পত্রটির সঠিক মূল্যায়ন ও স্থান-নির্দেশ তাই অতি জরুরী একটি দায়বদ্ধতা।

প্রথম অধ্যায়

সাপ্তাহিক ‘অমৃত’ সম্পাদকীয় : দেশ ও কালের প্রতিফলন

বাংলা সাহিত্যে এবং সমকালের অনান্য সাময়িকপত্রগুলির মতো ‘অমৃত’ পত্রিকার সম্পাদকীয়রও একটি বিশেষ ভূমিকা ছিল। রবীন্দ্রশতবার্ষিকী জন্মজয়ন্তীর দিন পত্রিকাটি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল বলে প্রতিটি বর্ষের প্রথম সংখ্যাটির সম্পাদকীয়টিতে প্রধানত রবীন্দ্র-অনুসঙ্গই ছিল বিশেষ বিষয়। অনান্য সংখ্যার রচনাগুলির বৈশিষ্ট্য ছিল সমকালের রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট এবং সামাজিক দায়বদ্ধতার কথা। যেমন কখনও উঠে এসেছে আসামের বরাক উপত্যকায় বাংলা ভাষা আন্দোলন নিয়ে ধারাবাহিক লেখা,

কখনও বা একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধ বা দেশের জরুরি অবস্থা। এইভাবে 'অমৃত' পত্রিকার সম্পাদকীয়গুলি সমকালের একটি সামাজিক দলিল হিসাবে স্বীকৃত হতে পারে।

পত্রিকাটির প্রথমে সম্পাদকীয় লিখতেন বিশিষ্ট সাংবাদিক ও সাহিত্যিক অমিতাভ চৌধুরী। তিনি বিদেশে যাবার পর সম্পাদকীয় রচনার দায়িত্ব পড়ে 'প্রবাসী' পত্রিকার সম্পাদক রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের সুযোগ্য পুত্র কেদারনাথ চট্টোপাধ্যায়ের উপর। তার মৃত্যুর পর দীর্ঘ সময় ধরে সম্পাদকীয় রচনা করেন সুসাহিত্যিক মণীন্দ্র রায়। স্বাভাবিকভাবেই এই লেখাগুলির গুরুত্ব ছিল অপরিসীম।

যেমন প্রথম বর্ষের তৃতীয় সংখ্যাটিতেই (২৬ মে, ১৯৬১) আসামের বাংলা ভাষার জন্য আসামের বরাক উপত্যকায় বাংলা ভাষা আন্দোলন নিয়ে বিস্তৃত ইতিহাস রয়েছে। আবার ১৩৭৫ সালের ২৭ অগ্রহায়ণ সংখ্যার সম্পাদকীয়টির বিষয় ভারতবর্ষের নানা রাজ্যে ছাত্র বিক্ষোভ। জাতীয় শিক্ষা নিয়ে লেখা রয়েছে ১৩৭৫-র ১৭ শ্রাবণ সংখ্যায়। এইভাবে আসামের পার্বত্য ও সমতল অঞ্চলের সমস্যা, ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধ, রাষ্ট্রভাষা হিসাবে হিন্দি-কে জোর করে প্রতিষ্ঠিত করা (৯ জ্যৈষ্ঠ, ১৩৭৬) প্রভৃতি 'অমৃত' পত্রিকার নানা সম্পাদকীয় রচনায় সামাজিক দায়বদ্ধতার নিদর্শন ঐতিহাসিক দলিলরূপে চিহ্নিত থাকতে পারে।

দ্বিতীয় অধ্যায়

সাপ্তাহিক 'অমৃত' পত্রিকার সূচি-সংকলন

সাপ্তাহিক 'অমৃত' পত্রিকার আয়ুষ্কালটি দীর্ঘ না হলেও বাংলা সাহিত্যে ও জনমানসে বিপুল প্রভাব ফেলেছিল। তাই সারস্বত অনুসন্ধিৎসাও সমৃদ্ধতর হয়ে ওঠে। ভবিষ্যতে বাংলা সাহিত্যের নানা ধারায় গবেষণার সুবিধার্থে এবং তথ্য সংগ্রহের একটি পরিষ্কার রূপরেখা যাতে সহজেই পাওয়া যেতে পারে। সেই লক্ষ্যেই কুড়ি বৎসরের এই সাপ্তাহিক পত্রিকাটির বিষয়ভিত্তিক ও কালানুসারী একটি সূচি সংকলন এই অধ্যায়টিতে সন্নিবেশিত করা হল।

তৃতীয় অধ্যায়

‘অমৃত’ সাহিত্য পত্রিকায় রবীন্দ্রপ্রসঙ্গ

১৯৬০-এর দশক থেকে ১৯৮০-র দশক পর্যন্ত ‘অমৃত’ পত্রিকা রবীন্দ্রপ্রসঙ্গ আলোচনায় যথেষ্ট ভূমিকা নিয়েছিল। পত্রিকাটিতে প্রকাশিত রবীন্দ্রপ্রসঙ্গের রচনাগুলি রবীন্দ্রগবেষণার ক্ষেত্রে এক বিপুল সংযোজন। এই প্রেক্ষিতে নানা বিখ্যাত সাহিত্যিক যেমন লিখেছেন, একইসাথে এক স্বতন্ত্র প্রাবন্ধিকগোষ্ঠীও গড়ে ওঠে।

‘অমৃত’ পত্রিকাতে রবীন্দ্রপ্রসঙ্গে লেখেন বুদ্ধদেব বসু (‘কবি রবীন্দ্রনাথ’), শশীভূষণ দাশগুপ্ত (‘গান্ধীজির চরকা ও রবীন্দ্রনাথ’), পূর্ণানন্দ চট্টোপাধ্যায় (‘শান্তিনিকেতন বিদ্যালয় ও ৭ই পৌষ’), প্রেমেন্দ্র মিত্র (‘পত্রলেখক রবীন্দ্রনাথ’), প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় (‘বনমহোৎসব ও রবীন্দ্রনাথ’), নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় (‘রবীন্দ্রনাথের একটি নাটক ও শেকসপীয়র’), অন্নদাশঙ্কর রায় (‘আধুনিক যুগ ও রবীন্দ্রনাথ’) প্রমুখ বিখ্যাত প্রাবন্ধিকগণ। বিশেষ উল্লেখ্য, ১৯৭১ সালের ১৬ এপ্রিলের তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের ‘রবীন্দ্রনাথ ও বাংলার পল্লী’ প্রবন্ধটি রবীন্দ্রসাহিত্যে একেবারে ভিন্নধর্মী একটি রচনা, যা ‘অমৃত’-এর পৃষ্ঠাতেই প্রকাশিত হয়।

আবার একইসাথে একটি লেখকগোষ্ঠীরও উদ্ভব ঘটে রবীন্দ্র-প্রাসঙ্গিক আলোচনায়। এই পত্রিকায় লেখেন হুমায়ুন কবির, মণীশ ঘটক, নরেন্দ্র দেব, বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, ক্ষিতিশ রায়, ধূর্জটীপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়-এর মতো লেখকগণ। রবীন্দ্রনাথের গান নিয়ে ‘অমৃত’-এ নানা রচনা প্রকাশিত হয় বীরেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ও কণিকা বন্দ্যোপাধ্যায়-এর। শেক্সপিয়রের চারশত জন্মবর্ষিকীতে রবীন্দ্রনাটক ও শেক্সপিয়রের তুলনামূলক আলোচনা করেছেন অজিতকুমার ঘোষ ও নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়।

বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে রবীন্দ্রপাঠ ও অনুশীলন নতুন করে শুরু হয়। সাপ্তাহিক ‘অমৃত’ পত্রিকা সেই ধারাকে ঋদ্ধতর করে তোলে। ফলে রবীন্দ্রচর্চার বিপুল পরিসরে ধারাবাহিক এই পত্রিকাটির গুরুত্ব অনস্বীকার্য।

চতুর্থ অধ্যায়

স্বামী বিবেকানন্দ ও সাপ্তাহিক 'অমৃত'

১৯৬১ সালে রবীন্দ্রজন্মশতবর্ষ পূর্তিতে রবীন্দ্রভাবনার তীব্র উন্মীলন ঘটে সাময়িক পত্র-পত্রিকাগুলিতে। পরবর্তী বৎসরেই বিবেকানন্দ জন্মশতবার্ষিকীতে স্বামীজি প্রসঙ্গটিও অতি গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে। প্রায় সমকালে জন্মগ্রহণের জন্য রবীন্দ্রনাথ ও বিবেকানন্দের শতবর্ষকালটিও সমসময়েই উদযাপিত হয়। সাপ্তাহিক 'অমৃত' এই ধারার প্রবহমানতাকে যথেষ্ট গুরুত্ব সহকারে বজায় রাখে।

'অমৃত' পত্রিকায় বিবেকানন্দ সম্পর্কীয় রচনাগুলির ভূমিকা কম গুরুত্বপূর্ণ ছিল না। যেমন 'বাংলার নবজাগৃতি: বিবেকানন্দ' -- অমিয় দত্ত (৩ পৌষ, ১৩৬৯), 'স্বামী বিবেকানন্দ' -- জওহরলাল নেহেরু (২৬ পৌষ, ১৩৬৯), 'বিবেকবাণী ও কবিতা-স্বামী বিবেকানন্দ' — সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত (৪ মাঘ, ১৩৬৯), 'নেতাজীর দৃষ্টিতে স্বামীজী' -- বনবিহারী মোদক (১১ মাঘ, ১৩৬৯), 'বিবেকানন্দের আরেকগুরু বিতর্কিত হেস্টি'' -- তুহিনশুভ্র ভট্টাচার্য (১৯৮০, শারদ সংখ্যা)।

বিশেষভাবে উল্লেখ্য 'অমৃত' পত্রিকায় বিবেকানন্দ প্রসঙ্গে একটি নতুন দিক উন্মোচনের পরিসর রয়েছে। পরিচিত বিবেকানন্দকে অতিক্রম করে সম্পূর্ণ ভিন্নরূপে তিনি উপস্থিত হয়েছেন প্রণতা দে-র 'অপ্রকাশিত বিবেকানন্দ ও উপেক্ষিতা ক্রিস্টিন' (১৮ ফেব্রুয়ারি—২৬ আগস্ট, ১৯৭৭) শীর্ষক রচনাটিতে। যা বিবেকানন্দ বিষয়ে আলোচনার ক্ষেত্রকে এক স্বতন্ত্র পথে নিয়ে গেছে।

'অমৃত'-এর পাতায় প্রায়শই লক্ষ্য করা গেছে রবীন্দ্র-বিবেকানন্দ প্রসঙ্গ একই পঙক্তিতে। এই রচনাগুলি 'অমৃত'-এর এক অমূল্য সম্পদ। যেমন 'বঙ্কিমচন্দ্র-রবীন্দ্রনাথ-বিবেকানন্দ' – দিজেন্দ্রলাল নাথ (২২ মাঘ, ১৩৭১), 'স্বামী বিবেকানন্দ ও কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ' – নরেন্দ্র দেব (২৫ ফাল্গুন, ১৩৬৮), 'রবীন্দ্রনাথ চাইলেও বিবেকানন্দ মেশেননি' – তুহিনশুভ্র ভট্টাচার্য (১৯৭৯, ২৪ আগস্ট) প্রভৃতি। এইভাবেই বিবেকানন্দ প্রসঙ্গের প্রবন্ধগুলি সমকালের অনন্য সাময়িকপত্রের থেকে 'অমৃত'-র একটি ব্যতিক্রমী স্থান রয়েছে।

পঞ্চম অধ্যায়

'অমৃত'-এ প্রকাশিত প্রবন্ধ ও বিশেষ নিবন্ধ

'অমৃত' পত্রিকার সমকালে বেশ কতকগুলি সাময়িকপত্রে এক উন্নতমানের প্রাবন্ধিক সম্মীলন ঘটেছিল। এরমধ্যে 'পূর্বাশা', 'দেশহিতৈষী', 'নন্দন', 'পরিচয়', 'যুগবাণী', 'শনিবারের চিঠি' ইত্যাদি পত্রিকাগুলির প্রবন্ধসম্ভার অত্যন্ত উল্লেখযোগ্য। 'যুগান্তর',

‘আনন্দবাজার’ এইসব দৈনিক পত্রিকার রবিবাসরীয়গুলিতে প্রকাশিত প্রবন্ধগুলিরও বাংলা সাহিত্যে এক গুরুত্বপূর্ণ অবদান রয়েছে। এই বহমানতায় ‘অমৃত’-র স্বতন্ত্র প্রবন্ধধারা একেবারেই উপেক্ষণীয় ছিল না।

‘অমৃত’ পত্রিকার আবির্ভাবকাল থেকেই এটির প্রবন্ধ অংশটি সমৃদ্ধ করেছেন রাজশেখর বসু, প্রমথনাথ বিশী, বুদ্ধদেব বসু, শশীভূষণ দাশগুপ্ত, তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত প্রমুখ প্রখ্যাত সাহিত্যিকগণ। এছাড়া বিষয়ভিত্তিক ধারাবাহিক প্রবন্ধগুলি হল সাহিত্যের অমূল্য সম্পদ। যেমন তুহিনশুভ্র ভট্টাচার্য লিখেছিলেন ‘রবীন্দ্রনাথ চাইলেও বিবেকানন্দ মেশেননি’ নামে অসামান্য প্রবন্ধ।

‘অমৃত’-এর বেশিরভাগ প্রবন্ধগুলি ছিল ইতিহাসাশ্রয়ী। দীর্ঘ সময় ধরে সুশান্তকুমার মিত্র লিখেছেন বাংলার প্রধান গ্রন্থাগারগুলির বিস্তৃত ইতিহাস, ‘আমরা গড়ে তুলি’ শীর্ষনামে। প্রণব রায় রচিত দীর্ঘ ধারাবাহিক ‘পুরাতত্ত্বের সন্ধানে’। অন্নদাশঙ্কর রায় রচিত ধারাবাহিক রচনা ‘বাংলার রেনেসাঁস’ ‘অমৃত’-এর পাতায় একটি উল্লেখযোগ্য সংযোজন। এরকম অজস্র উদাহরণের মধ্যে সবথেকে উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত হল স্বনামধন্য সাংবাদিক বিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায় রচিত দুটি পর্বে প্রকাশিত দীর্ঘ ঐতিহাসিক দলিল ‘দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের ইতিহাস’। অর্থাৎ, ‘অমৃত’-এর পাতায় প্রকাশিত প্রবন্ধের ভাবনা ছিল সম্পূর্ণত ভিন্ন রুচির। সেখানে যেন এক দীর্ঘ ইতিহাসের রূপান্তরণ ঘটেছে, যার মূল্যবিচার বর্তমান সময়ে অতীব প্রাসঙ্গিক।

ষষ্ঠ অধ্যায়

সাপ্তাহিক ‘অমৃত’-এর কথাসাহিত্য

সাহিত্য আন্দোলনের প্রেক্ষাপটে সাময়িকপত্র, বিশেষ করে সাপ্তাহিক পত্রিকাগুলিতে প্রকাশিত কথাসাহিত্যের ধারা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এই পত্রিকাগুলি উপন্যাস, গল্প ইত্যাদি নিয়ে এক সমকালীন মান নির্দিষ্ট করে দেয়। ‘পূর্বাশা’ সাহিত্য পত্রিকার অন্তিমলগ্নে ‘অমৃত’-র আবির্ভাব।

‘দেশ’ পত্রিকার উজ্জ্বলপর্বেই ‘পূর্বাশা’ পত্রিকায় বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ‘পথের পাঁচালী’-র অপ্রকাশিত অংশ, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ‘পদ্মানদীর মাঝি’-র মতো ধারাবাহিক উপন্যাসের সাথে সাথে বুদ্ধদেব বসু, তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত, প্রেমেন্দ্র মিত্র প্রমুখ প্রথিতযশা সাহিত্যিকগণের নিয়মিত ছোটো গল্প রচনা একটি স্বতন্ত্র সাহিত্যগোষ্ঠীর সূচনা করেছিল। ‘পূর্বাশা’-র প্রকাশ অনিয়মিত হয়ে পড়ায় উল্লিখিত সাহিত্যিকগণ ‘অমৃত’-এ নিয়মিত লেখক হিসাবে আবির্ভূত হন। এদের সঙ্গে যোগ দেন শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রবোধকুমার সান্যাল, নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, আশাপূর্ণা দেবী-র মতো প্রতিষ্ঠিত সাহিত্যিকগণ। একইভাবে ‘অমৃত’ পত্রিকাকে অবলম্বন করে বুদ্ধদেব গুহ, অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়, অদ্রীশ বর্ধন, দেবল দেববর্মা, সৈয়দ মুজতবা সিরাজ, অমর মিত্র-র মতো লেখকগণকে কেন্দ্র করেও নতুন এক সাহিত্যগোষ্ঠীর জন্ম নেয়।

মাত্র কুড়ি বছরের আয়ুষ্কালে সাপ্তাহিক 'অমৃত'-কে কেন্দ্র করে একদল প্রবীণ ও নবীন ঔপন্যাসিকগণ সমবেত হয়েছিলেন। অনেক অসামান্য উপন্যাসের প্রকাশ ঘটেছে 'অমৃত'-র পাতায় পাতায়। 'কহেন কবি কালিদাস' (শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়), 'বিবাগী ভ্রমর' (প্রবোধকুমার সান্যাল), 'সূর্য কাঁদলে সোনা' (প্রেমেন্দ্র মিত্র), 'গোলাপ কেন কালো' (বুদ্ধদেব বসু), 'কীর্তিহাটের কড়চা' (তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়), 'কখনো দিন কখনো রাত' ও 'দিনান্তের রঙ' (আশাপূর্ণা দেবী), 'পৌষ ফাগুনের পালা' ও 'আমি কান পেতে রই' (গজেন্দ্রকুমার মিত্র), 'মসিরেখা' (জরাসন্ধ), 'আলোকপর্ণা' (নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়), 'পূর্ণাবতার' (প্রমথনাথ বিশী), 'নূরিয়া' (লীলা মজুমদার), 'অগ্নিতুষার' (প্রতিভা বসু) ইত্যাদি। নবীন সাহিত্যিকগণের বিখ্যাত উপন্যাসগুলিও ধারাবাহিকভাবে লেখা হতে লাগল 'অমৃত'-এ। যেমন বুদ্ধদেব গুহ-র 'কোয়েলের কাছে' ও 'একটু উষ্ণতার জন্য', নিমাই ভট্টাচার্যের 'মেমসাহেব', প্রফুল্ল রায়-এর 'কেয়া পাতার নৌকা', অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিখ্যাত ট্রিলজি— 'অলৌকিক জলযান', 'নীলকণ্ঠ পাখির খোঁজে' ও 'ঈশ্বরের বাগান', শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়ের 'অদ্য শেষ রজনী', শৈবাল মিত্রের 'তরণী পাহাড়ে বসন্ত', এইরকম বাংলা সাহিত্যের বেশ কয়েকটি কালজয়ী উপন্যাস। এক দীর্ঘসময় ধরে সাপ্তাহিক 'অমৃত'-এ একইসাথে প্রকাশিত হয়েছে তিনজন এমনকি চারজন ঔপন্যাসিকেরও বিখ্যাত ধারাবাহিকগুলি। বিশেষত পত্রিকার সপ্তম ও অষ্টম বর্ষে (১৯৬৭-১৯৬৮)।

'অমৃত' সাপ্তাহিকে অসাধারণ সব গল্প ও বড়ো গল্প লিখেছেন মহাশ্বেতা দেবী, লীলা মজুমদার, নবনীতা দেবসেন, নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, সতীকান্ত গুহ, অমিয়ভূষণ মজুমদার, শৈবাল মিত্র, চন্ডী মন্ডল, অমর মিত্র, অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়, শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়, অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত, বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায় প্রমুখ লেখকগণ। 'অমৃত'-এর অজস্র সুলিখিত ছোটোগল্প ও উপন্যাসগুলির সামগ্রিক অবদান বাংলা সাহিত্যে একটি স্থায়ী ও অনুপেক্ষণীয় আসন যে নির্দিষ্ট করে, সেখানে সন্দেহের কোনো অবকাশ নেই।

সপ্তম অধ্যায়

'অমৃত'-য় প্রকাশিত কবিতা সম্ভার

'অমৃত' পত্রিকার প্রথমার্ধে অগ্রজ কবিদের মধ্যে সঞ্জয় ভট্টাচার্য, মঙ্গলাচরণ চট্টোপাধ্যায়, বিষ্ণু দে, অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত, দীনেশ দাস, রাম বসু, তারাপদ রায়, দক্ষিণারঞ্জন বসু, এদের কবিতা সাময়িকপত্রটিকে সমৃদ্ধ করেছিল। একইভাবে 'দেশ' পত্রিকার সাথে সাথে সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, শক্তি চট্টোপাধ্যায়, অমিতাভ দাশগুপ্ত প্রভৃত কবিরাও 'অমৃত'-এ লিখেছেন। আবার মণীন্দ্র রায়, আনন্দ বাগচী, কিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত-র মতো কবিদেরও 'অমৃত'-এর পাতায় ছিল উজ্জ্বল উপস্থিতি।

'অমৃত' পত্রিকাটি কুড়ি বছর ধরে প্রায় নিয়মিত প্রকাশ হয়েছে। প্রতি সপ্তাহের নিরবচ্ছিন্ন প্রকাশের ফলে 'অমৃত'-এর কবিতা সম্ভারও বিপুল। ভাষা ও কালের প্রেক্ষিতে, একটি বিশেষ সাহিত্যে রচিত কবিতারও একটি নিদিষ্ট ভূমিকা থেকেই যায়। 'অমৃত' পত্রিকাটির মধ্যেও সেই দায়বদ্ধতা বিশেষভাবে লক্ষ্য করা গিয়েছিল।

অষ্টম অধ্যায়

নাটক প্রকাশনা এবং নাট্য-আলোচনায় 'অমৃত' পত্রিকা

ক্ষুদ্র আয়ুষ্কালে সাপ্তাহিক 'অমৃত' পত্রিকায় প্রকাশিত নাটকের সংখ্যা খুব বেশি নয়। এই পরিসরে মোট তিনটি পূর্ণাঙ্গ নাটক ও ছয়টি একাঙ্কিকা প্রকাশিত হয়। বুদ্ধদেব বসু রচিত একটি বিশেষ কাব্যনাট্যও এখানে উল্লেখযোগ্য সংযোজন হিসাবে ধরা যেতে পারে। এছাড়াও পত্রিকাটির একটি শারদ সংখ্যায় শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় রচিত অপ্রকাশিত নাট্যাংশটিরও একটি অনন্য ভূমিকা রয়েছে।

'অমৃত' পত্রিকার অত্যন্ত ঋদ্ধ দিকটি হল, নানা সংখ্যায় প্রকাশিত অসামান্য নাট্য আলোচনা। চারশো বৎসরের জন্মোৎসবে শেকসপীয়রের নাটকগুলি ও সেগুলির অভিনয় নিয়ে আলোচনা বাংলা সাহিত্য জগতে এক বিরাট প্রাপ্তি। 'বহুরূপী' নাট্য সংস্থাকৃত রবীন্দ্রনাট্যোৎসবটি উপলক্ষ্যে যে দীর্ঘ আলোচনাটিও 'অমৃত'-এ প্রকাশ পেয়েছিল, তার গুরুত্বও অপরিসীম। নাটক যখন সাহিত্য হয়ে ওঠে, সেটির আলোচনার দিকটিও নিদিষ্ট মর্যাদার দাবি রাখে। 'অমৃত'-র নাট্য আলোচনা ক্রমশ সাহিত্যধারার সাথে তাই একাত্মীভূত হয়ে উঠেছিল।

উপসংহার

একটি অনন্যসাধারণ সাহিত্য সাপ্তাহিকের বিলুপ্তি ঘটেছিল নানা অর্থনৈতিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক দ্বান্দ্বিকতায়। তবুও সাহিত্যে তার মর্যাদা এবং অবদান কোনোভাবেই ক্ষুন্ন হয় না। পত্রিকাটির একটি সামগ্রিক রূপরেখা প্রকাশ পেলে, তা ভবিষ্যৎ পাঠককে উৎসাহিত করতে পারে। সাপ্তাহিক 'অমৃত' পত্রিকা দীর্ঘ সময় ধরে প্রকাশিত হতে পারেনি। তবুও বাংলা সাহিত্য-ইতিহাসে 'অমৃত' পত্রিকাটি ঘিরে যে বিপুল সম্ভাবনার উন্মেষ ঘটেছিল, সেখানে এর বিস্মরণ আমাদের কিছুটা অপরাধী ও দায়বদ্ধ করে তোলে। বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে বিলুপ্ত সাহিত্য পত্রিকা 'অমৃত'-এর এই আলোচনা, বিশ্লেষণ ও গবেষণা একটি নতুন সংযোজন হবে।

তথ্যপঞ্জি :

১) 'অমৃত' পত্রিকা: ১ম বর্ষ-১৯ বর্ষ, সাপ্তাহিক শারদীয়া ও অনান্য বিশেষ সংখ্যা।

সম্পাদক – তুষারকান্তি ঘোষ

আনন্দ চ্যাটার্জী লেন, কলিকাতা-৩

২) সুকুমার সেন, 'বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস', আনন্দ, কলকাতা, ২০০৫

৩) বংশী মান্না, 'ভারতীয় সংবাদপত্রের ইতিহাস', সুবর্ণা প্রকাশনী, কলকাতা, ১৯৯৫

৪) অমর দত্ত, 'অমৃতবাজার পত্রিকা ও অনান্য', প্রগ্রেসিভ পাবলিসার্স, কলকাতা, ২০১৩

৫) কমল চৌধুরী (সম্পাঃ), 'অমৃত গল্পসম্ভার', পত্রভারতী, কলকাতা, ২০১৮

৬) শ্যামাপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়, 'দেশ পত্রিকায় রবীন্দ্রচর্চা', আনন্দ, কলকাতা, ২০০৫

৭) স্বপন বসু ও হর্ষ দত্ত, 'বিশ শতকের বাঙালি জীবন ও সংস্কৃতি', পুস্তক বিপনি, ২০০০

৮) সত্যপ্রিয় ঘোষ, 'পূর্বাশা সংকলন' (১), পঃ বঃ বাংলা আকাদেমি, ২০০১

৯) চিত্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়, 'রবীন্দ্র প্রসঙ্গ, আনন্দবাজার পত্রিকা' (১), আনন্দ, কলকাতা, ১৯৯৩

১০) চিত্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়, 'রবীন্দ্র প্রসঙ্গ, আনন্দবাজার পত্রিকা' (২), আনন্দ, কলকাতা, ২০০১

১১) সাগরময় ঘোষ (সম্পাঃ), 'দেশ' (সুবর্ণ জয়ন্তী গল্প সংকলন), আনন্দ, কলকাতা, ১৯৮৩

১২) সাগরময় ঘোষ (সম্পাঃ), 'দেশ' (সুবর্ণ জয়ন্তী প্রবন্ধ সংকলন), আনন্দ, কলকাতা, ১৯৮৪

১৩) সাগরময় ঘোষ (সম্পাঃ), 'দেশ' (সুবর্ণ জয়ন্তী কবিতা সংকলন), আনন্দ, কলকাতা, ১৯৮৪

১৪) প্রবুদ্ধ চট্টোপাধ্যায় (সম্পাঃ), 'একটি আলোকপ্রবাহ, উনিশ থেকে একুশ শতক'

(উত্তরপাড়া জয়কৃষ্ণ সাধারণ গ্রন্থাগার স্মারকগ্রন্থ), ২০০৯

১৫) তাপস ভৌমিক (সম্পাঃ), 'বিলুপ্ত সাহিত্য পত্রিকা' (কোরক), ১৪১৩

১৬) ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, 'বাংলা সাময়িক-পত্র' (অখন্ড), করুণা প্রকাশনী, কলকাতা, ২০১৩

১৭) স্বপন বসু, 'সংবাদ-সাময়িক পত্রে উনিশ শতকের বাঙালিসমাজ', পঃ বঃ বাংলা আকাদেমি, ২০০০

১৮) দিলীপ মজুমদার (সম্পাঃ), ‘বাঙ্গালা সাময়িক সাহিত্য’, এডুকেশন ফোরাম, কলকাতা, ২০১০

১৯) শ্রীলা বসু, ‘পরিচয় পত্রিকায় রবীন্দ্রপ্রসঙ্গ’, ঊষা প্রকাশনী, কলকাতা

২০) প্রণতি মুখোপাধ্যায়, ‘রবীন্দ্রপ্রসঙ্গ: মাসিক বসুমতি’, কলকাতা

২১) অমল পাল (সংকলক), ‘কিশোরপাঠ্য পত্রিকা পঞ্চক; সূচি-সংকলন’, দে’জ পাবলিশিং, কলকাতা